ব্লু চেয়ার

কৌশিক সামন্ত

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

স্যামুয়েল
সেনোরিটা
ভৈরব
ঋ
ডেভিড
তানিয়া
বাড়িটা
ভিকি আর কুশল
রিজওয়ান
জ্যাকেট
প্যাট্রিজো
ফ্যান্টম লিম্ব
ফ্র্যান্সিস

স্যামুয়েল

একটা বন্ধ দরজা আর সেটাকে ঘিরে সারি সারি চিন্তিত মুখ!

বন্ধ দরজার হাতলটা টেনে আটকানো আছে একটা সিলভার ক্রস দিয়ে, বাড়তি সাবধানতা হিসেবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একগুচ্ছ এলোমেলো জং ধরা শিকল।

হ্যাজাকের উজ্জ্বল বাতিও সেই লোকগুলোর মুখের কালো অন্ধকার খুব একটা দূর করতে পারছে না। সবাই বিড়বিড় করে চাপা স্বরে নিজেদের মধ্যে কিছু একটা বলে চলেছে। লোকগুলো মাঝে মাঝেই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সেই বন্ধ দরজার দিকে তাকাচ্ছে আর বাতাসে ক্রস আঁকছে। বাইরে রাত্রি যত বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে

বাড়ছে শীত আর সেই বন্ধ দরজাটাকে ঘিরে ভয়টা। চারদিক বন্ধ, তাও বাইরের বাতাস কোনোভাবে সেই বন্ধ দরজার হাতল স্পর্শ করে যাচ্ছে। কেঁপে উঠছে দরজা আর তার সেই সামান্যতম কম্পনে উপস্থিত মানুষগুলো এক অজানা আশঙ্কায় চমকে উঠছে বারবার।

ঠিক এমনি সময় সদর দরজায় কড়া নাড়ার একটা শব্দ। গৃহস্বামীর দীর্ঘশ্বাস বলে দেয় কিছু যেন কাঙ্ক্ষিত হয়েছে, এত আঁধারেও। দ্রুত পায়ে এসে দরজাটা খুলে দেন।

পুরোদস্তুর ওভারকোটে ঢাকা এক আগন্তুক প্রায় নিঃশব্দে প্রবেশ করে ঘরে। ঘরে ঢুকেই হাতের ব্রিফকেস আর মাথার টুপিটা নামিয়ে রেখে চাঁচাছোলা গলায় প্রথম প্রশ্ন করে,

"মেয়েটা কোথায়?"

গৃহস্বামী নীরবে আঙুল তুলে বন্ধ দরজার দিকে দেখায়।

আর কোনও কথা না বাড়িয়ে, সেই আগন্তুক তার ব্রিফকেস থেকে অদ্ভুত দর্শন একটা ছোট কাঠের বাক্স বের করে আনে। সাথে একটা জরাজীর্ণ বাইবেল। সেগুলো হাতে নিয়ে সে এগিয়ে যায় বন্ধ দরজার দিকে।

বন্ধ দরজার শিকলে হাত দিতেই পাশ থেকে প্রশ্ন ভেসে আসে,

"তুমি কি নিশ্চিত, এই কাজটা তুমি করতে পারবে? দরজার ওপারে কিন্তু এক ভয়ঙ্কর শয়তান অপেক্ষা করে আছে। মুহূর্তের সামান্য ভুল আর চরমতম ক্ষতির মুখে পড়তে হতে পারে তোমাকে!"

পাশ থেকে ভেসে আসা ফাদার রেমন্ডের এই গম্ভীর সাবধানবাণী, আগন্তুককে সেদিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য করে।

স্পিরিটে ভেজা তুলো দিয়ে নিজের ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করছিলেন ফাদার রেমন্ড। আগন্তুকের শান্ত চোখে চোখ রেখে তিনি বলে চলেন,

"আই হ্যাভ ট্রায়েড মাই বেস্ট। আমার যতটা শিক্ষা, যতটা বিদ্যা, যতটা ক্ষমতা - তার সবটাই প্রয়োগ করেছি, কিন্তু দরজার ওপারে যে আছে সে এক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী ডেমন। আমি পারিনি তাকে হার মানাতে। এই যে আমার হাল কী হয়েছে দেখ। চার্চের তরফ থেকে কম দিন তো হল না আমি এক্সোরসিজমের কাজ করছি, কিন্তু আগে

কখনও এত শক্তিশালী ডেমনের মুখোমুখি আমি হইনি। তাই আমার সাজেশন, তুমি দরজাটা খুলো না। আমি ইতিমধ্যে ঘরের চারপাশটা পবিত্র শক্তি দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। চার্চের অভিজ্ঞ লোকেরা না আসা অবধি, আমার মতে এভাবেই রেখে দেওয়া প্রয়োজন।"

"ততক্ষণ কি আপনার সেই ভয়ঙ্কর ডেমন, এই ভদ্রলোকের মেয়ের অস্তিত্বের আর কিছু বাকি রাখবে বলে আপনার মনে হয় ফাদার?"

আগন্তুকের প্রত্যুত্তরে চুপ করে যান ফাদার রেমন্ড, কারণ সত্যিই এর উত্তর তাঁর কাছে নেই।

গৃহকর্তা, মেয়েটার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আগন্তুক মৃদু হাসে তারপর বলে,

"চিন্তা করবেন না, দিস ইজ নট মাই ফার্স্ট টাইম। আপনারা দরজা খোলার ব্যবস্থা করুন আর অতি অবশ্যই আমার টাকাটা রেডি রাখবেন।"

ক্যাঁচ! এক ঝটকায় দরজাটা খুলে আগন্তুক ঘরে প্রবেশ করে। তারপর আওয়াজ না করে চুপিসাড়ে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়।

ঘরের মধ্যে একটা হ্যাজাক জ্বলছে। তার উজ্জ্বল আলোয় দেখা যায় ঘরের ভেতর ছড়িয়ে রয়েছে ঘন কুয়াশার একটা থকে থকে আস্তরণ। যেন গলা টিপে মারতে চাইছে আলোকে। অপার্থিব একটা পরিবেশ। বাইরের জগতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, ডেমনের উপস্থিতির জন্য আদর্শ।

অপর্যাপ্ত আলোয় সামনের টেবিলে হোঁচট খেতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেয় সে। জুতোর সামনেটা চটা উঠে গেছে। কোথা থেকে যেন একটা চাপা ব্যাঙ্গের হাসির আওয়াজ ভেসে আসে। আলো আঁধারিতে চোখ কিছুটা সয়ে যেতেই সেই শব্দের উৎসের ছবিটা পরিস্কার হল। বিছানার উপর একটা বাচ্চা মেয়ে শুয়ে আছে। তার হাত পা গুলো শক্ত করে খাটের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা। পরণের ফ্রকটা দফারফা, চাপচাপ রক্ত লেগে আছে তাতে।

নিজের বাক্সটা খুলে কয়েকটা কালো মোমবাতি বের করে আনে আগন্তুক। তারপর মোমবাতিগুলোকে একে একে জ্বালিয়ে

সেনোরিটা

এক

সুন্দরী এবং স্মার্ট, কোমল ত্বকের রং তুলতুলে সাদা রুটির মতো, কাঁচা আমন্ডের মতো সবুজ চোখের মণি! কাঁধের উপরে এলিয়ে পড়েছে দীঘল কাজল অবিন্যস্ত অলকাদাম!

মার্জিত রুচির পোশাক, চামড়ার লোমশ জ্যাকেট! র' সিল্কের জামাটায় হাল্কা ফুলের নকশা ছাপা আর সাদা লিনেনের ট্রাউজার্স! জুতোয় বোগেনভেলিয়া ফুলের রং চিকন ডোরা দাগ!

ঠিক যেন গার্সিয়া মার্কেসের, el avion de la bella durmiente!

দমদমের এয়ারপোর্টে প্রথম দেখাতেই যেন তার প্রেমে পড়ে গেছিলেন সমরেশ।

- আপনি মিঃ সমরেশ সেন? আমাকে ডিসুজা পাঠিয়েছিল।

- হ্যাঁ, আমিই সমরেশ সেন! আপনার নাম?

- সেনোরিটা।

- সেনোরিটা! বাঙালিদের এটা আবার কীরকম নাম? প্রশ্ন করেছিলেন সমরেশ।

- আমাদের পেশায় আসল নাম বলতে নেই যে। খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল সেই তিলোত্তমা।

বিশ্ব বিখ্যাত ভাস্করশিল্পী সমরেশ সেনের জীবনে ভাড়া করা শয্যাসঙ্গিনীর কখনোই কোনও অভাব ছিল না।

'এক সে বড় কর এক' তাদের রুপের ঝলক, দেহের বৈচিত্র। সমরেশ কে খুশি করলেও, তৃপ্ত করতে পারেনি।

ডিসুজার এস্কর্ট কোম্পানির মেয়েরা তার কাছে আগেও এসেছে কিন্তু আজকের সেনোরিটার মতো আগে কেউ কখনো...

- পুরো রাতটা এয়ারপোর্টেই কাটাবেন নাকি আরও কিছু প্ল্যান আছে?

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা সমরেশের দিকে মৃদু হেসে প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েছিল সেনোরিটা।

সেই শুরু, তারপর দিনের পর দিন রাতের পর রাত - সেনোরিটা। সমরেশ সেনের নেশা হয়ে উঠেছিল।

ডিসুজা কে ফোন করে তিনি সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'যত টাকা লাগে লাগুক সেনোরিটা শুধু আমার, আর কারো নয়'।

বাধ্য মেয়ের মত সেনোরিটাও সায় দিয়েছিল।

তিনি ঠিক করেছিলেন, এই সবকিছু ছেড়ে দূরে তাঁরা কোথাও চলে যাবেন, যেখানে অতীত ইতিহাসের কোন হাতছানি থাকবে না। নতুন করে সবকিছু আবার শুরু করবেন তারা।

ছোট্ট একটা বাড়ি হবে তাঁদের। তার মধ্যে একটা রুমে সমরেশের স্টুডিও থাকবে সেখানে মূর্তি বানাতে মশগুল মিস্টার সেনের জন্য রান্নাঘর থেকে নিজের হাতে চা বানিয়ে আনবে সেনোরিটা।

না, একটু ভুল হল। সেনোরিটা নয় - স্নিগ্ধা। তখন তার নাম হবে স্নিগ্ধা।

চায়ের কাপ নেওয়ার অছিলায় সমরেশ তাকে জড়িয়ে ধরবেন আর রান্নাঘরের গরমে অনভ্যস্ত, স্নিগ্ধার পেটের উপর জমা বিন্দুবিন্দু

ঘামের আদ্রতা এক নিমেষে শুষে ফেলবেন।

বহুদিন ধরেই মনের মধ্যে এই মূর্তিটা বানিয়ে চলেছিলেন সমরেশ সেন।

শুধু মনেই নয় বাস্তবেও তাঁর ড্রইংরুমে দাঁড় করিয়ে রাখা সেনোরিটার মূর্তিটা সেই ভালোবাসারই জানান দেয়।

গত দু'সপ্তাহ ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি তাকে গড়ে তুলেছেন।

- ওয়াও... এটা তো অবিকল আমার মতো। থ্যাঙ্ক ইউ শিল্পী মশাই।

প্রথম দিন মূর্তিটাকে দেখেই, সেনোরিটা আনন্দে সমরেশকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেদিন রাতের আদরটাও একটু বেশীই হয়েছে, অন্তত সমরেশের পিঠে দগদগে নখের দাগগুলো সেটাই জানান দেয়।

সেনোরিটা আপ্লুত হলেও, সমরেশের মনে একটা খুঁত থেকেই গেছিল। মূর্তিটার মধ্যে কোথায় যেন একটা কিছুর অভাব থেকে গেছে।

তিনি অনেক ভেবেছেন, অনেক দেখেছেন, এমনকী পাশাপাশি দুই সেনোরিটাকে দাঁড় করিয়েও দেখেছেন, কিন্তু খুঁজে পাননি। বরং সেই অভাব বোধটা দিন দিন তার মাথায় চাপতে শুরু করেছে।

পিক পিক পিক!

সেনোরিটার ফোনটা বাজছে, হোয়াটসঅ্যাপ টোন!

বাথরুমে জলের আওয়াজ। মার্কেট থেকে ফিরে এসেই সেনোরিটা স্নান করতে ঢুকেছে। অন্য সময় সে ফোনটা নিজের সাথেই নিয়ে যায়। এমনকী বাথরুমেও। আজ কীভাবে যেন ভুলে গেছে।

দোনামনা করেও, ফোনটা শেষ অবধি তুলে নেন সমরেশ।

- ছবির রেট কত?

- পার নিউড ১০০০, ফুল ফ্রন্টাল ২৫০০!

হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজগুলো পড়ে ধপ করে সোফার উপর বসে পড়েন সমরেশ সেন।

এতক্ষণে... ঠিক এতক্ষণে শিল্পী সমরেশ সেন আসল অভাবটা ধরে ফেলেছেন।

তিনি উঠে পড়েন, হাতে তুলে নেন সেনোরিটার গিফট করা দামি ফুলদানীটা আর একটু একটু করে এগিয়ে চলেন বাথরুমের খোলা

ভৈরব

এক

আজ সকাল থেকেই কোলাহল কানে আসছিল নরেন্দ্র নারায়ণের, যত বেলা বেড়েছে, পাল্লা দিয়ে বেড়েছে কোলাহলের মাত্রাও।

নাহ্। এতে অবশ্য বিরক্তি আসেনি তাঁর, বরং পিতৃপুরুষের বানানো এই প্রাসাদসম নির্জন অট্টালিকায়, এই অসময়ের কোলাহল খানিক প্রাণের সঞ্চারই করছে বটে।

আরাম কেদারায় বসে, জানলা দিয়ে আসা বসন্তের পড়ন্ত হাওয়ায়, অনেক কিছু মনে পড়ে যাচ্ছিল নরেন্দ্র নারায়ণের।

এই আরাম কেদারাখানা ছিল তাঁর পিতামহ রঞ্জিত নারায়ণের, সময়ের কালচক্র পেরিয়ে এখনও অটুট, ঠিক তাঁর পূর্বপুরুষদের আভিজাত্যের মতো।

দেওয়ালের গায়ে লাগানো পিতৃপুরুষদের ছবিগুলো লক্ষ্য করছিলেন নরেন্দ্র নারায়ণ, এই বিশাল জমিদার বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ বা লোকলস্কর কিছু আর অবশিষ্ট নেই নরেন্দ্র নারায়ণের। ছবিগুলোর উপর জমে থাকা ধুলোর স্তর বুঝি সেটারই জানান দিচ্ছে।

তবু ঐ ছবিগুলোর মুখে লেগে থাকা রাজকীয় সম্ভ্রম, হাজার ধুলোর ঘনঘটাতেও ঢাকা পড়বে না, ভাবছিলেন নরেন্দ্র নারায়ণ।

"এই কে আছিস, এদিকে একটা কাপড় নিয়ে আয় তো।" বেশ মেজাজেই বললেন তিনি।

আগেকার দিন হলে নরেন্দ্রনারায়ণের এক হুংকারে পড়িমড়ি করে চোদ্দজন লোক হয়ত হুকুম তামিলে ছুটে আসত, কিন্তু তিনি নিজেও জানেন আজ সেটা কতটা অবাস্তব ব্যাপার।

তাই আর চেঁচামেচি না করে, অপেক্ষা করতে লাগলেন, কখন তাঁর একমাত্র বুড়ো চাকর হরিপদ টুকটুক করে আসে এদিকে।

বেশি অপেক্ষা অবশ্য করতে হল না তাঁকে।

"আজ্ঞে বাবু ডাকছিলেন? কিছু কাজ ছিল?"

"না রে হতভাগা, তোকে মশকরা করার জন্য ডাকছিলাম। একটা কাপড় নিয়ে এই ছবিগুলো পরিষ্কার কর ভালো করে। আমি কিছু না বললে তো কারুর কিছু চোখেই পড়ে না, সব লাটের বাট এক একটা।"

হরিপদ কালবিলম্ব না করে কাজে লেগে পড়ল।

আরে, কোলাহল হঠাৎ করে এদিকেই আসছে না? কান খাড়া করে শুনতে লাগলেন নরেন্দ্র নারায়ণ, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তো ওই দীঘি পুকুর মারা সম্ভব নয়।

তাঁর পিতামহ রঞ্জিত নারায়ণের আমল থেকেই এই বিশেষ দিনটার সূত্রপাত।

কালপ্রবাহে বাকি সব ঐতিহ্য ভেসে গেলেও, এই উৎসব কিন্তু আজও টিকিয়ে রেখেছেন নরেন্দ্র নারায়ণ। হৈ হৈ করে বছরের এই একটা দিন, দীঘি পুকুরের সব জল মারা হয় জেলেদের দিয়ে। যা মাছ ধরা পড়ে তার কিছু সামান্য অংশ গোবিন্দ নারায়ণের সেবায় লাগানো হয়, বাকিটা প্রজাদের দিয়ে দেওয়া হয়।

এবারও সেরকমই হচ্ছিল, কিন্তু...

"কী হল সর্দার? দীঘি ছেড়ে এই অসময়ে তোমরা সব এখানে কেন?" বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করলেন নরেন্দ্র নারায়ণ।

সারি দিয়ে জেলেদের দল নরেন্দ্র নারায়ণের সামনে এসে গোল করে দাঁড়িয়েছে, তাদের গা ভর্তি দীঘি পুকুরের পানা, চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে জল, ভিজিয়ে দিচ্ছে জমিদার বাড়ির দামী কার্পেট।

"মাফ করবেন হুজুর, কিন্তু আজ জালে হঠাৎ এমন একখান জিনিস উঠল, আপনার কাছে না এনে আর পারলুমনি" বিনীতভাবে হাতজোড় করে জেলে সর্দার জানায়।

একটা বিশাল ধাতব ঘড়া।

সবাইকে সরিয়ে নরেন্দ্রনারায়ণ দেখলেন, একটা সীলবন্ধ ঘড়া। কত যুগের যে শ্যাওলা যে তার ওপর জমেছে, তার ইয়ত্তা নেই।

"কী সাংঘাতিক, এ সব্বনেশে জিনিস তোরা কোথা থেকে জোটালি?" আঁতকে উঠলেন নরেন্দ্র নারায়ণ।

"জালে উঠল হুজুর, আমরা কী করব বুঝতে না পেরে আপনার কাছে সোজা নিয়ে এলাম।"

"যক্ষের ধন মনে হচ্ছে, ঘড়াটা তোরা কেউ খুলিস নি তো?"

"আজ্ঞে না হুজুর।"

"এই হরিপদ ভেতরের ঘরটা খুলে দে। সর্দার এই ঘড়াটা নিয়ে গিয়ে ওখানে রেখে এস। দরজায় তালা মেরে চাবি আমাকে দিয়ে যাবে। আর হরিপদ অন্তরমহলে বলে দিস গুরুদেব না আসা অবধি, কেউ যেন ও ঘরে না ঢোকে। আমার কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়, নইলে চরম সর্বনাশ ঘটে যাবে।"

দুই

নিজের চেয়ার টেবিলে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন নরেন্দ্র নারায়ণ।

মাথায় হাত দেওয়া ছাড়া তাঁর সত্যিই বুঝি করার কিছুই নেই। সেদিনের আশঙ্কা যে এভাবে তাঁর নিজের জীবনেই সত্যি হয়ে উঠবে একথা তিনি দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি।

ঘড়াখানা এই ঘরে ঠাঁই দেওয়াই তাঁর মূর্খামী হয়ে গেছে।

কিন্তু নিজের স্ত্রীকেও পুরো দোষ তিনি দিতে পারেন না। সেই